একজন হাফিজউদ্দিন মিয়ার স্মৃতি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আমরা যারা বাংলাদেশে বসবাস করি এবং এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন বলে দাবি করে থাকি, তারা কী সবাই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস জানি– বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার কে, কার হাত ধরে ৫০ বছর আগে আমরা কমপিউটারের যুগে পা রেখেছিলাম, বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজক কে, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ কে? এমন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর তথা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এ দেশে কপিউটারের আগমণ ঘটলেও আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে আছি। কেননা আমরা ভুলেই গেছি ইতিহাস শুধুই অতীত বা অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর লিপিবদ্ধই নয়, বরং ইতিহাস হলো আগামী দিনে সামনের দিকে এগিয়ে চলার দিক-দির্শেনা, উৎসাহ-প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা ইত্যাদী।

এ কথা সত্য, যে জাতি তার প্রকৃত ইতিহাস জানে না বা অতীত থেকে শিক্ষা নেয় না, সে জাতি কখনই ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না। যেহেতু আমরা অতীতের উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেই না, তাই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এ দেশে কমপিউটারের আগমন ঘটে থাকলেও আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে সেভাবে এগোতে পারিনি।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার হাফিজউদ্দিন মিয়ার ওপর প্রতিবেদন। কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত হয় মোস্তাফা জব্বারের এ বিষয়ে এক লেখা। এ লেখা থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৬৪ সালে কীভাবে বাংলাদেশে প্রথম কমপিউটারটি আসে। ১৯৬৪ সালে স্থাপন করা এ কমপিউটারটি ছিল আইবিএম মেইনফ্রেম ১৬২০। বৃহৎ আকারের এ কমপিউটারটি স্থাপন করতে দুটি বড় রুম ব্যবহার করতে হয়েছিল। ঢাউস আকারের এ কমপিউটারটিকে ঢাকার আণবিক শক্তি কমিশনে স্থাপন করা হয়েছিল। এ লেখা পড়ে আমরা জানতে পারলাম, ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম কমপিউটারটি স্থাপনের পেছনে কার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

ধন্যবাদ মোস্তাফা জব্বারকে। বলা যায়, তার একক প্রচেষ্টায়ই আমরা জানতে পারলাম বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামারের অবদান। তাকে আরও ধন্যবাদ জানাই এ কারণে, অনেকটাই তার উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার হাফিজউদ্দিন মিয়াকে মরণোত্তর সম্মাননা জানিয়েছে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫ শীর্ষক মেলার সমাপনী আয়োজনে হাফিজউদ্দিন মিয়ার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

আমরা যারা প্রযুক্তিপ্রেমী, তারা প্রায় সবাই জানি, আশি-নব্বই দশকে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের প্রায়ই মনে করত বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক বিস্তার করলে দেশে বেকারত্বের হার শুধু বাড়বেই না বরং অনেকেই চাকরিচ্যুত হবে। এমনই এক বৈরী পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক আবদুল কাদের বাংলায় তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক এক পত্রিকা মাসিক 'কমপিউটার জগৎ' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল সে সময় এক দুঃসাহসিক কাজ।

কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদের যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আগামী দিনে তথ্যপ্রযুক্তিই হবে অর্থনীতির মুক্তির চাবিকাঠি– ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি। এ কারণেই তিনি কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা শুরু করেন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' জোরালো দাবি জানিয়ে।

দেশে কমপিউটারের ব্যবহার ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে কমপিউটারকে নিয়ে গেছেন গ্রামে-গঞ্জে। তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য করেছেন বিভিন্ন সভা-সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন। দেশের প্রোগ্রামারদের উৎসাহিত করতে নিজ উদ্যোগে আয়োজন করেন দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। ইন্টানেটের সুফল জনগণের সামনে তুলে ধরতে আয়োজন করেন দেশের প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রায় বিনামূল্যের ফাইবার অপটিকের সংযোগের অফার যখন হাতছাড়া হতে যাচ্ছিল, তখন এ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে করেছেন সংবাদ সম্মেলন। কমপিউটার প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহকদের বিনামূল্যে দেন কমপিউটার জগৎ প্রকাশিত আটটি গাইড বই। অধ্যাপক আবদুল কাদের কমপিউটার জগৎ-এ আইসিটিবিষয়ক বিভিন্ন লেখা প্রকাশের জন্য দেশের স্বনামধন্য সাংবাদিকসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতেন, তেমনি গাইডলাইনও বাৎলে দিতেন। এভাবে তিনি দেশে সৃষ্টি করেন আইসিটিবিষয়ক সাংবাদিক। আজ দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে আইসিটির জন্য আলাদা পাতা হয় তারও প্রেরণার উৎসাহ অধ্যাপক আবদুল কাদের।

আমরা প্রযুক্তিপ্রেমীরা চাই, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও আইসিটি বিভাগ বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার হাফিজউদ্দিন মিয়াকে যেভাবে সম্মাননা দিয়েছে, ঠিক সেভাবে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মরহুম আবদুল কাদেরকেও তার অবদানের কথা বিবেচনা করে সম্মাননা দেবে।

আবদুস সামাদ
পল্লবী, ঢাকা

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত

জেলা প্রশাসন যদি দায়িত্বশীল হয়, তাহলে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তার কর্মস্পৃহাকে ব্যাহত করতে পারে না। হোক না তা সরকারি কাজ। এমনই এক নজির স্থাপন করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, যা কমপিউটার জগৎ পত্রিকায় জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালের মার্চের শেষ দিকে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে এনইএসএস কার্যক্রমে চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল ৬২তম। এই হতাশাজনক অবস্থানের পেছনে কারণ ছিল ইন্টারনেটের ধীরগতি, কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব আর কর্মচারীদের নিস্পৃহ উদাসীন মনোভাব। এছাড়া এ কার্যালয়ের কমপিউটারগুলো ছিল আধুনিক প্রযুক্তির মাপকাঠিতে সেকেলে। মে ২০১৪ থেকে এ কার্যালয়ের আইসিটি শাখাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। পুরনো-নষ্ট কমপিউটারগুলো যুগোপযোগী করা হয়। বিভিন্ন ধাপে আরও ২২টি কমপিউটার ও দুটি ল্যাপটপ কেনা হয় সরকারি বরাদ্দের বাইরে।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম ছিল ইন্টারনেট সংযোগ ও এর ধীরগতি। এছাড়া বিভিন্ন সময় এ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে আগে স্থাপিত ল্যান (LAN) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সারা অফিসের সব কক্ষে নতুন করে ল্যান সংযোগ দেয়া হয়। কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাউটার বসিয়ে পুরো অফিসকে ওয়াই-ফাইয়ের আওতায় আনা হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্যাকেজে ১৩ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়। ১১৬টি কমপিউটার ও ২৩টি ল্যাপটপের সমন্বয়ে এ কার্যালয়কে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সব সেবা স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ও ঝামেলাহীনভাবে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর দেশের সব জেলার সাথে চট্টগ্রামে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ২০১৩ সালের ১ জুলাই জেলা ই-সেবা কেন্দ্রটি জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম তথা এনইএসএস দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার কার্যালয়ে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্টডেস্ককে নতুন আঙ্গিকে ও বড় পরিসরে সাজানোয় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা এ কেন্দ্রকে করেছে গতিময় ও অত্যাধুনিক। আমরা আশা করি, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের অন্যান্য জেলা প্রশাসন তাদের সেবামূলক কার্যক্রমকে আরও সহজ করবে।

দাউদ ইব্রাহীম
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা